চতুর্থ অধ্যায়

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : কাব্য শৈলীগত তুলনা

কাব্যসাহিত্য হল ভাষাশিল্প প্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বয়ান বিচার বা Text analysis এবং ভাষা বিশ্লেষণ -এর মধ্যদিয়ে কাব্য দুটির শৈলীবিচার ও শৈলীগত তুলনা করা যেতে পারে। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে শৈলীবিজ্ঞানের পথ চলা শুরু হয়েছে— 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' বক্তব্যটির মধ্য দিয়ে। পশ্চিমে আমরা অলঙ্কার শব্দটিকে 'rhetoric' হিসাবে পাই। এটির উৎস গ্রীক শব্দ 'techno rhetorike' থেকে। যদিও অলঙ্কার সম্পর্কে ভারতীয় আর পশ্চিমের মতাদর্শ কিছুটা পৃথক। তাই বলা যায়— "The term is derived from the Greek techno rethorike, the art of speech. An art connected with the use of people speaking as a means of persuasion."[১] আবার অনেকের মতে—''স্টাইলিস্টিক্স বা শৈলীবিজ্ঞান বিংশ শতকের ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) এবং আধুনিক সাহিত্য সমালোচনা (Modern Literary criticism)-এর যৌথ ফসল। গত শতকের চারের দশকে Leo Spizer ভাষাবিজ্ঞান অনুসরণে শৈলী বিষয়ক আলোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এই সময় য়ুরোপের একটি ভাষার সম্পদ-সঙ্গতির অনুসন্ধানে সক্রিয় হয়েছিলেন। Charles Bally এবং তার অনুগামী ভাষাবিজ্ঞানীরা সব ধরনের সাহিত্য কর্মের ক্ষেত্রে যুক্ত হতে পারে এমন একটি ভাষাতাত্ত্বিক সাধারণ সূত্রের অন্বেষণে সচেষ্ট হলেন। Karl Vossler এবং অপর কয়েকজন ভাষাতাত্ত্বিক বিশিষ্ট কোন সাহিত্যকর্মের শৈলীবিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় অগ্রসর হলেন। ভস্‌লার Dante -এর কাব্যকৃতির সামগ্রিক আলোচনা প্রসঙ্গে Divine Comedy-র শৈলী বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন।''[২]

শৈলী বা রীতির ইতিহাস খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় আমাদের দেশে এর জন্ম অনেক আগে। কিন্তু পশ্চিমে এটি গত শতকের শেষভাগে প্রথম দেখা মেলে। তাই ভারতীয় রীতিবাদ ও পাশ্চাত্যের শৈলীবিজ্ঞান দুটি ভিন্ন পথের যাত্রী। অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে সাহিত্যের খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনা বা নন্দনতত্ত্বের জন্ম হয়েছে। কিছু ভারতীয় তাত্ত্বিক অলঙ্কার শাস্ত্রের

রীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন—

১. দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ'-এ মার্গ অর্থাৎ বিশেষ বাক্‌ভঙ্গীর কথা গুরুত্ব পেয়েছে।

২. ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' দেশভেদে চারটি প্রবৃত্তির কথা বলা হয়েছে।

৩. ভামহ'র 'কাব্যালংকার'-এ দেশভেদ রীতিভেদকে মানা হয়নি।

৪. রুদ্রট এর 'বাক্যালংকার'-এ গুণের কথা বলা না হলেও চারটি রীতির কথা পাই।

৫. রাজশেখর 'কাব্য মীমাংসা'য় তিনটি রীতির কথা বলেন।

৬. ভোজ 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ'-এ ছয়টি রীতির কথা বলেছেন।

৭. মম্মট 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে শব্দবিন্যাসের সাথে বৃত্তি জড়িত বলে উল্লেখ করেছেন।

৮. রুয্যক 'অলঙ্কারসর্বস্ব'-তে জানালেন তিনটি বৃত্তির কথা। পুরুষ, কোমল আর মধ্যম বৃত্তি।

প্রাচীনকালে ভারতে শৈলী সম্পর্কে বলতে গিয়ে রীতিবাদের আলোচনায় দেখা যায়— ''The term 'stylistic' has been in use the early 19th century and in English it is found as early as 1846 (Oxford English Dictionary). Stylistics as the 'art of forming good style in writing and as, the science of literary style.' One few of the meaning given in dictionaries.''[৩] -উনিশ শতকের প্রথমভাগে 'স্টাইলিষ্টিক' Stylistik বা শৈলীবিজ্ঞান পরিভাষাটি প্রথম পাওয়া যায় এবং ১৮৪৬ খিস্টাব্দে Oxford -এর ইংরেজি অভিধানে এই শব্দটির প্রথম দেখা মেলে। তবে অভিধানে এই শব্দটির অনেকগুলি শব্দার্থ পাওয়া যায়। তবুও এর বাংলা পরিভাষা হিসাবে 'শৈলীবিজ্ঞান' -এর পাশাপাশি 'রীতিবিজ্ঞান'কেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থে একটি লেখার বিশেষ ধরণ-ধারণের কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য বিচার বিশ্লেষণের কথাও বলা হয়েছে। যদিও বর্তমানে তাতে পরিবর্তন এসেছে বিস্তর। এ প্রসঙ্গে অভিজিৎ মজুমদার বলেছেন—''বিশ শতক এবং এই সময়ের সাহিত্য সমালোচনায় শৈলীবিজ্ঞান এক অভিনব দিগ্‌দর্শন। ভাষার বিজ্ঞানমুখী অনুশীলন থেকে ভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভব। আর সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ থেকে শৈলীবিজ্ঞানের (stylistics) -এর সূত্রপাত। সমালোচনার যে ধারা এতকাল ধরে চলে এসেছে, সাহিত্যকৃতির বিষয়বস্তু, প্লট, চরিত্র অথবা সামাজিক পটভূমিকেই তা প্রাধান্য দিয়েছিল। কিন্তু শৈলীবিজ্ঞান

সমালোচকের এহেন বিশ্লেষণে নতুন এক মাত্রার সংযোজন করেছে। আর তা হল রচনার ভাষা। আসলে সাহিত্য যে মূলত ভাষাশিল্প, ভাষার মতো সাহিত্যকৃতিরও রয়েছে নিজস্ব ব্যাকরণ, এই ধারণাটি একালে নতুনভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে ভাষাবিজ্ঞান আশ্রিত শৈলীবিজ্ঞানের জয়যাত্রাও শুরু হয়ে গিয়েছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দাবি করেন, শৈলীবিজ্ঞান হল—"The branch of linguistic study which is primarily concerned with this integration of language and literature. (Simpson, 1997. 2)"[৪]

অনেক ভাষাবিজ্ঞানী প্রাচ্যের 'রীতি' ও পাশ্চাত্যের 'স্টাইল'কে একভাবে দেখতে চান। এই রীতি বা স্টাইল হল সাহিত্যের অন্তরাত্মা বা সাহিত্যের সর্বস্ব। ডব্লু হাস তাঁর একটি রচনায় স্পষ্টই বলেছিলেন যে— "It is of course ultimately, some relation of linguistic expression to other things that constitutes their meaning. The question is : what sore of relation? My point is that it is not and cannot be, a relation between two distinct orders of things. One alleged confronkation of language with facts, the alleged reference of expressions to things uninvolved in language-this we cannot make sense of. If we divide language from other things in this dualist fashion both are dissolved in a general blur."[৫]

মানব শরীরের আত্মা যেমন, যা ছাড়া দেহ অচল ও অবশ, শৈলীকে ঠিক সেই অর্থেই দেখা হয়ে থাকে। যদিও বর্তমানে রীতিবিজ্ঞানী বা শৈলীবিজ্ঞানীরা একে স্টাইল, রীতি, শৈলী এই সব বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে Leach Geoffrey N, 3 short, Miehacl H মনে করেন—"In its must general interpretation, the word 'STYLE' has a fairly uncontroversial meaning, it refers to the way in which language is used in a given context, by a given person, for a given purpose and so on."[৬] অর্থাৎ এখানে ভাষাকে কে কোথায় এবং কীভাবে প্রয়োগ করেছে সেটিই শৈলীর অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ড. অভিজিৎ মজুমদার লিখেছেন—রচনার শৈলী বয়ানের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণের ভিত্তিতে। ক্রিস্টাল ও ডেভি (১৯৬৯) র মতে 'শৈলী' শব্দটির কতগুলি বৈশিষ্ট্য হল—

প্রথমত, ব্যক্তির ভাষা প্রয়োগের নিজস্বতাই হল শৈলী। লেখকের ভাষা প্রয়োগ ও লক্ষণের ভিত্তিতে এই নিজস্বতা চিহ্নিত হয়ে থাকে। যেমন—রবীন্দ্রনাথ কিংবা বঙ্কিমের ভাষাশৈলীর স্বকীয়তা সম্পর্কে পাঠকেরা যখন সচেতন হয়ে ওঠেন, তখন রচয়িতার স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গটি পাঠকের সামনে বড় হয়ে দেখা দেয়। শৈলীর বিচারে কোন রচনার ব্যতিক্রমী ভাষা বৈশিষ্ট্যগুলিই গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কারণ এই ভাষা লক্ষণগুলিই সন্দেহাতীত ভাবে রচয়িতাকে শনাক্ত করতে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়, কোন নির্দিষ্ট সময়কালে এক বা একই ধরনের ভাষা ব্যবহারকারী গোষ্ঠী দ্বারাও গড়ে উঠতে পারে তাদের নিজস্ব ভাষাশৈলী। যেমন—বঙ্কিম বলয়ের প্রাবন্ধিক কিংবা মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাদের সাহিত্যকীর্তিতে এইরকম গোষ্ঠীশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, শৈলী বিচারের ক্ষেত্রে এতক্ষণ তন্ময় দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মন্ময় (Subjective) দৃষ্টিকোণ থেকেও শৈলী বিচার করা যেতে পারে। যেমন—রচনার মূল্যায়নের মাত্রা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে শৈলী। দু'জন কবির কবিতার মধ্যে পার্থক্য। কেউ যদি বলে জীবনানন্দের কবিতা দুর্বোধ্য এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠকের কাছে বোধগম্য তবে তা এক ধরনের মূল্যায়ন। এক্ষেত্রে পাঠকের প্রতিক্রিয়ার ওপর রচনার স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা নির্ভর করে।

চতুর্থত, সাহিত্যে ভাষার মানের ওপর ভিত্তি করে শৈলী চিহ্নিত হতে পারে। কারণ রচনার নান্দনিকতা, যথার্থ বা সৌন্দর্যের সঙ্গে শৈলীর প্রসঙ্গটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই জড়িয়ে থাকে।

রচনার রূপ ও ভাবব্যঞ্জক শব্দার্থে শৈলীবিজ্ঞান stilistique ফরাসী সাহিত্যের অভিধানে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে স্থান পায়। ১৮৮২-৮৩ র মধ্যে ওল্ড ইংলিশ ডিক্সনারীতে 'রেগুলার ওয়ার্ড' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জার্মান ভাষায় অবশ্য ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই stylistik বা শৈলীবিজ্ঞান শব্দটির ব্যবহার লক্ষিত হয়। Ullmann -এর সংজ্ঞায় বলেছেন— ''Stylistics is not a branch of linguistics, it is a parallel science which examines the same problems from a different point of view.''[৭]

Ullmann -এর সংজ্ঞায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যও রয়েছে। Linguistics ও Stylistik -এর মূল পার্থক্য উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। এম. গ্রেগরী এবং ই. জে স্পেনসার রচিত

'লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌ অ্যান্ড স্টাইল, (১৯১৪) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—ভাষার স্বাভাবিক 'ক্রমের' ব্যতিক্রম বিচারই স্টাইলিস্‌টিকস্‌ -এর ধর্ম, অপরপক্ষে লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌ ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিবিচার, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনা করে। আসলে শৈলী বিচারে রচনার গঠন ও গমক। নির্মাণ ও নির্মিতি ভাব ও ভাষা উভয়েরই পূর্ণ পরিচয় দেয়। তাই শৈলী বা স্টাইলিস্‌টিকস্‌ -এর গুরুত্ব লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌ -এর থেকে অনেক বেশি। তবে উভয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম যোগও রয়েছে। তাই বলা যায়—''Roughly speaking, two utterances in the same language which convey approximeetely the same information, but which are different in their linguistic structure, can be said to differ in style.''[৮]

এই শৈলী বিশ্লেষণের কারণে অনেক অজ্ঞাত, অপরিচিত লেখকের প্রকৃত পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে A. Q. Morton মনে করেন—'' 'অজ্ঞাত', বা 'অপরিচিত' লেখকের পরিচয় নিয়ে বিশ্বের সকল সাহিত্যেরই যে সমস্যা তার সমাধানের সুযোগ আসন্ন।''[৯] কিছু অঙ্ক ও রেখাচিত্রের সাহায্যে এই বৃহৎ সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়ে থাকে। ফলে ছদ্মনামে লেখা কোন লেখক বা সন্দেহভাজন লেখক এই অঙ্ক বা রেখাচিত্রের দ্বারা নিজেদের আসল পরিচয় দিতে বাধ্য থাকেন। যেমন—চণ্ডীদাস সমস্যার কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। মোট কতজন চণ্ডীদাস আছেন? কিংবা বিদ্যাপতির সবকটি পদ সত্যিই তাঁর দ্বারা রচিত কিনা? এই সব সমস্যার সমাধান মর্টনের দেওয়া তথ্যের সাহায্যে হওয়া উচিত। এই বিচার পদ্ধতিটি ভাষাতত্ত্বের 'শৈলীবিজ্ঞান' বা 'স্টাইলিস্‌টিক্‌সে'র অন্তর্ভুক্ত। ভাষার স্বভাবের উপর নির্ভর করে এসব নির্ধারণ করা সম্ভব। যেমন—

১. শব্দ ব্যবহারে লেখক কোন 'প্যাটার্ণে' লিখছেন, যেমন—বিদ্যাপতির পদে ব্যবহৃত শব্দ। তার ভাব ও বারবার তাদের প্রয়োগ।

২. সর্বনাম এবং শব্দ সাযুজ্য'র প্রয়োগ স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ। যেমন—কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রয়েছে—

ক. ''সেই জন পণ্ডিত সেজন মহাবীর।''[১০]

খ. ''জেই জন না করে তোমার স্বহায়ন
কিবা হরি সেবায় ভাজন।''[১১]

৩. বাক্য সংযোজক শব্দের ব্যবহার ও অব্যয় জাতীয় শব্দের ব্যবহার। যেমন—

ক. ‘‘আর রমণী বলে সই কহিতে বাসি লাজ।’’[১২]

খ. ‘‘আর যুবতি বলে মোর স্বামী বড় কালা।’’[১৩]

এখানে সংযোজক হিসেবে ‘আর’ অধিবাচনিক সংলগ্নতার সৃষ্টি করে।

কিন্তু প্রধানত দুটি কারণে ভাষা বিশ্লেষণের এই তিনটি প্রচলিত নিয়ম সুনিপুণ সিদ্ধান্ত উপস্থিত করতে পারে না। তার প্রথম কারণ, এই রীতিতে সমগ্র গ্রন্থের বিশ্লেষণ করা হয় না, গড়পড়তা হিসাব করা হয় মাত্র। ফলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অবকাশ থেকেই যায়। দ্বিতীয়ত, এই আনুমানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিটিও যথেষ্ট ব্যাপক নয়। বাক্যবিন্যাস, পদগুচ্ছ প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিক অপরিহার্য বিষয়গুলি সর্বদা এই পদ্ধতিতে গৃহীত নাও হতে পারে। ফলে ভাষার পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় না। তবে এক্ষেত্রে মর্টন সংখ্যাতাত্ত্বিক কতকগুলি চার্টের কথা বলেছেন। এর নাম cumulative sum charts method. এই পদ্ধতির সুবিধা হল রচনাগত কোন ব্যতিক্রম হলেই তা নজরে পড়বে। অর্থাৎ চণ্ডীদাসের পদ কিংবা রামমোহনের যে গ্রন্থগুলিতে তাঁদের নাম অপ্রকাশিত ছিল, সেই সকল গ্রন্থগুলি যদি অন্য কারোর রচনা বলে সন্দেহ হয়, তবে সেই সন্দেহাকীর্ণ রচনাগুলি আর রামমোহন বা চণ্ডীদাসের রচিত গ্রন্থগুলির ভাষা যদি এই ‘Cumulative sum charts method’ -এর সাহায্যে বিচার করা যায়, তবে ভাষাগত কোন পার্থক্য থাকলে তা অবশ্যই চোখে পড়বেই এবং সেই পার্থক্যই বলে দেবে যে রচনাটি আদৌ রামমোহন বা চণ্ডীদাসের রচনা কিনা। বাক্যের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি নিয়ে বিশ্লেষণের পদ্ধতিটি খুব একটা জটিল নয়। যেমন—

১. যে রচনা নিয়ে সংশয় তার প্রতিটি বাক্যের শব্দসংখ্যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ বই -এর বা রচনার বাঁদিক থেকে ডান দিকে (বাঁ > ডান)

২. রচনাটির বাক্যপ্রতি গড়পড়তা শব্দ সংখ্যা নির্ধারণ করা। ধরা যাক কোন একটি পুথি পাওয়া গেছে এবং পুথিটি দেখে মনে হল এটি ভারতচন্দ্রের। সেটি প্রমাণের জন্য ঐ গ্রন্থটির সমস্ত বাক্যের প্রতিটি শব্দের গড়পড়তা হিসেব করা আবশ্যক।

৩. প্রকৃত শব্দ সংখ্যা প্রতি কাব্যে যতগুলি আছে তার সঙ্গে ঐ গড়পড়তা শব্দ সংখ্যা হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ গড়পড়তা শব্দ সংখ্যা যত হবে বাক্যগুলির শব্দ সংখ্যাও তত করতে হবে। ধরা যাক ১ নং বাক্যে ১০টি শব্দ আছে। ২ নং বাক্যে ১৫টি ও ৩ নং বাক্যে

২০টি শব্দ আছে। তাহলে গড়পড়তা বাক্য প্রতি শব্দ সংখ্যা ১৫টি। এক্ষেত্রে ২ নং ও ৩ নং বাক্যের ১৫ - ৫ (+ ৫) এবং ২০ - ১০ (+ ৫) এবং ১ নং বাক্যের কোন পরিবর্তন নেই।

৪. হিসাবের এই অঙ্কটি যে রেখাচিত্রে প্রকাশিত হবে তার দুটি সরলরেখা থাকবে, একটি সমান্তরাল, অন্যটি লম্বিত। সমান্তরাল রেখায় রচনার বাক্য সংখ্যা থাকবে এবং লম্বের উপর থাকবে স্বতন্ত্র বাক্যের শব্দ সংখ্যা ও গড়পড়তা বাক্যের শব্দ সংখ্যার পার্থক্য জনিত হিসাব।[১৪]

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কাব্য শৈলীগত তুলনা করা যেতে পারে। আলোচনাটি ক. বয়ানকেন্দ্রিক প্রসঙ্গ (Textual Context) এবং খ. বয়ান-অতিরিক্ত প্রসঙ্গে (Extra-Textual) বিভক্ত। বয়ানকেন্দ্রিক প্রসঙ্গকে আবার নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে—

ক. বয়ানকেন্দ্রিক প্রসঙ্গ (Textual Context) :

১. রূপবন্ধরীতি (Compositional Frame)

২. ভাষিক রীতি (Linguistic Frame)

অ. ধ্বনিগত শৈলীবিচার

আ. রূপগত শৈলীবিচার

ই. বাক্য ও অধিবাচন নির্ভর শৈলীবিচার

ঈ. শব্দ ও শব্দার্থ নির্ভর শৈলীবিচার

৩. শিল্প প্রকরণ।

প্রথাগত ঐতিহ্য মেনে মঙ্গলকাব্যের কাহিনিগুলি নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এতে কবি কল্পনার কোন স্থান নেই। পূর্ব ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় যে কাহিনি কবির কাছে এসেছে তার মূল বিষয়গুলিকে অপরিবর্তিত রেখে কবিরা কাহিনিকে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেন। মুকুন্দের কাব্যে সংরূপের প্রতি অনুগত্য লক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ মুকুন্দের কাব্যে উপন্যাসের লক্ষণ তাঁর কাব্যকে এক ভিন্ন মর্যাদা দিয়েছে। সেখানে রামানন্দ মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত দিককে বজায় রেখেছেন। আখ্যানের সঙ্গে চরিত্রের নিগূঢ় মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন মুকুন্দ। উপন্যাসের পথে যাত্রা করলেও মঙ্গলকাব্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকে সরে আসেননি কবি। দুই বিরুদ্ধ প্রবণতার দ্বন্দ্ব কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যুগের চিন্তাধারা কবির স্বাধীন

চিন্তার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তিনি কাব্যে অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছেন। কবি লোকায়ত উপাদানকে অধিক পরিমানে আশ্রয় করেছেন, ফলে অভিজাত সাহিত্য ও লোকায়ত সাহিত্যের ভেদরেখা মুছে গেছে। রামানন্দ তাঁর কাব্যে লোকায়ত উপাদানকে পরিত্যাগ করেছেন।

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি উভয়ের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের তুলনা করলে শৈলীগত পার্থক্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি দুই ভিন্ন শতাব্দীর কবি। মুকুন্দের কাব্যের কাহিনি কিছুটা দীর্ঘ, সেই তুলনায় রামানন্দের কাহিনি অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। মুকুন্দ কাব্যে গার্হস্থ্য পারিবারিক জীবন ও পরিবারের কোন্দলের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। রামানন্দ কিন্তু পুরো বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়ে কাব্যে দেবীর বন্দনাকে বড় করে দেখিয়েছেন। বন্দনাংশে রামানন্দ অন্যান্য দেব-দেবীদের বন্দনার সঙ্গে ভাগীরথী, পুরী ও সূর্য মন্দিরের বর্ণনা ও বন্দনা করেছেন।

কবিকঙ্কণ রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করলেও তাঁর কাব্যের কাহিনিতে লৌকিকতা অধিক প্রয়োগ লক্ষণীয়। রামানন্দ আখ্যান নির্মাণে পুরোপুরি রামায়ণ, মহাভারত এবং বিবিধ পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কাহিনির প্রয়োজনে কখনো কখনো লৌকিকতাকে গ্রহণ করলেও অধিকাংশ সময়ে কাহিনির সেই অংশটিকেই এড়িয়ে গেছেন। যেমন—কালকেতুর জন্ম, বিবাহ ইত্যাদির প্রসঙ্গ রামানন্দের কাব্যে নেই। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই অংশগুলির বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কবি বাস্তব সচেতন মন নিয়ে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন, ফলে হর-গৌরীর পারিবারিক জীবন বাস্তবিক হয়ে উঠেছে। রামানন্দের কাব্যে জীবনরসের অভাব রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব মুকুন্দের তুলনায় রামানন্দের কাব্যে অধিক বাস্তবতার সঙ্গে পরিবেশিত। আবার চরিত্রচিত্রণে মুকুন্দ অনেক বেশি সচেতন মুরারি শীল চরিত্রটি কাব্যে স্বল্প পরিসরেই উজ্জ্বল।

মুকুন্দের কাব্যে কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো বা পরোক্ষভাবে বার বার উঠে এসেছে ব্যক্তি জীবনের কথা। এ সম্পর্কে বলা যায়— "It may Partly or exclusively operate upon the experience of the man himself; but the more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates."[১৫]

রামানন্দ কিন্তু সেরকম কোন ব্যক্তিপরিচয় বা ব্যক্তিজীবনের কথা বলে যাননি। তবে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রাপ্ত রামানন্দের চণ্ডীমঙ্গল পুথিতে দ্বিজ কৃষ্ণকান্ত নামক একজন ব্যক্তি কবি সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন।

গঠনগত দিক থেকে কবিকঙ্কণের মূল কাব্যের কাহিনি তিনটি—

১. শিব-পার্বতী কাহিনি

২. কালকেতু-আখ্যান

৩. ধনপতি উপাখ্যান

তবে ধনপতি উপাখ্যানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—ধনপতির পারিবারিক কাহিনি ও ধনপতি-চণ্ডী বিবাদের কাহিনি।

রামানন্দও কাহিনিকে ঠিক একইভাবে সাজিয়েছেন। তিনটি ভিন্ন গল্পকে তাঁরা একত্রিত করে পরিবেশন করেছেন। মুকুন্দ দেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে যে কাব্য রচনা করেছেন তাতে দেবীর ভূমিকাই প্রধান। রামানন্দের কাব্যে কবি চণ্ডীর সঙ্গে অন্যান্য দেবতাদেরও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। 'লোকপুরাণ' অংশটি যথা—নারীদের পতিনিন্দা, গণেশের জন্ম, হরগৌরীর কলহ ইত্যাদি অংশে কবিকঙ্কণ অনেক বেশি প্রাণবন্ত। রামানন্দ লোকপুরাণ অংশটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন।

কাহিনির প্রাণকেন্দ্রে কবি মুকুন্দ স্থাপন করেছেন গার্হস্থ্য এবং পারিবারিক জীবন। রামানন্দ পারিবারিক জীবনকে গুরুত্ব দেননি। মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের তুলনায় মুকুন্দের কাব্যের বন্দনা অংশটি সংক্ষিপ্ত। মূল কাব্যের কাহিনি বর্ণনাতেও কবি মুকুন্দ পূর্ব প্রথাকে অনুসরণ করেছেন। যেমন—নারীগণের পতিনিন্দা। নতুন বরের রূপদর্শনে নারীরা নিজেদের বরের দুর্নাম করে ও বয়স জনিত অসঙ্গতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে। এই বিষয়টি অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যেই দেখতে পাওয়া যায়। রামানন্দের কাব্যে তা অনুপস্থিত। শাপভ্রষ্ট দেবতাদের মর্ত্যে আগমন এবং দেবীর পূজা প্রচারের অন্তে আবার স্বর্গারোহন মুকুন্দ এবং রামানন্দের কাব্যে মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ রীতি মেনেই বর্ণিত।

দেবীর কাঁচুলিতে দশাবতার ও দেবতাদের চিত্রাঙ্কণ মঙ্গলকাব্যের প্রথানুসৃত। মুকুন্দ এ প্রথাকে মেনে কাব্য নির্মাণ করেছেন। কিন্তু রামানন্দ এ বিষয়টিকে তিরস্কার করেছেন।

ফুল্লরার বারমাস্যা বা দেবীর শতনাম কীর্তন (চৌতিশা) চণ্ডীমঙ্গলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির কাব্যে যা বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। কাজেই মঙ্গলকাব্যের প্রথাবদ্ধ রীতিকে মেনে কাব্য রচনা করলেও মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির কাব্যে আখ্যানগত পার্থক্যগুলি বেশ স্পষ্ট।

কালকেতু আখ্যানে গঠনের স্বরূপ :

কালকেতুর ঘটনা-বিন্যাস নিম্নরূপ—

১. কালকেতুর জন্ম, বাল্যকাল

২. কালকেতুর বিবাহ

৩. কালকেতুর পশু শিকার

৪. পশুদের চণ্ডীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা

৫. চণ্ডী-ফুল্লরা-কালকেতুর কথোপকথন

৬. নগর নির্মাণ ও কালকেতুর রাজা হওয়া

৭. নতুন নগরের বিবরণ

৮. ভাঁড়ুর চক্রান্ত ও কালকেতুর বন্দীদশা

৯. নায়কের বিপদ মুক্তি।

শাপভ্রষ্ঠ নীলাম্বরের কালকেতু রূপে জন্ম লাভে কাহিনির সূচনা। মুকুন্দ ও রামানন্দ এ কাহিনি মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ রীতি মেনেই অঙ্কন করেছেন।

তবে লক্ষণীয় যে কালকেতুর রূপ বর্ণনা, ভোজন পর্ব, বিবাহ ও পশু শিকারের বর্ণনা রামানন্দ দেননি। কালকেতুর মৃগয়ার বর্ণনা খুব সামান্যই রয়েছে রামানন্দের কাব্যে।

পরবর্তীকালে কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি ও রাজ্য নির্মাণ অংশটি উভয়ের কাব্যে এক। এ পর্যন্ত কাহিনিতে কোন কেন্দ্রিয় সমস্যা নেই। প্রকৃত সমস্যার সূত্রপাত কাহিনির একেবারে শেষে কলিঙ্গ রাজের আগমনে। কালকেতু রাজা হওয়ায় কলিঙ্গরাজের সঙ্গে কালকেতুর বিরোধ বাধে।

কালকেতুর কাহিনিতে কিছু ঘটনা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সংযোজিত হয়েছে। আর কালকেতু রাজা হওয়া পর্যন্ত ঘটনাগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত। মুকুন্দের কাব্যে সেই বিষয়গুলি থাকলেও রামানন্দের কাব্যে সেসব ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায় না।

ধনপতি আখ্যানে গঠনের স্বরূপ :

১. ধনপতির পারিবারিক কাহিনি

২. ধনপতির সঙ্গে চণ্ডীর বিবাদের কাহিনি।

এই কাহিনিগুলির মধ্যে সমস্যা বা ঘটনাগত কোনো যোগসূত্র নেই। তবে দুটি কাহিনিতেই ধনপতির দুটি পৃথক চিত্তবৃত্তির সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রথমটি ধনপতির কামনা-বাসনার দ্বারা সৃষ্ট এবং দ্বিতীয়টি ধনপতির ধর্মভাবনা সম্পর্কিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কবিকঙ্কণ ঠিক এইভাবেই ধনপতি চরিত্রের নির্মাণ করে কাহিনি গঠন করেছেন। রামানন্দ কিন্তু ধনপতিকে এই রূপে নির্মাণ করেননি। রামানন্দের ধনপতির কামনা-বাসনা নেই। শুধুমাত্র পুত্র প্রাপ্তির আশায় তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। ধনপতি উপাখ্যান পরিপূর্ণরূপেই চরিত্রকেন্দ্রিক নয়, ঘটনাকেন্দ্রিক। দৈব শক্তির স্বেচ্ছাচারিতা পরিচালিত করেছে কাহিনিকে।

মুকুন্দের ধনপতি আখ্যানের প্রথম কাহিনির ঘটনা বিন্যাস নিম্নরূপ—

১. খুল্লনার ধনপতির প্রণয়

২. লহনাকে ছলনা করে বিবাহের জন্য সম্মতি আদায়

৩. ধনপতি খুল্লনার বিবাহ

৪. ধনপতির বিদেশ গমন

৫. লহনা খুল্লনার কলহ

৬. খুল্লনার দুর্ভোগ

৭. স্বামীর প্রত্যাবর্তন ও সুখমিলন

এসব কাহিনির মধ্যে খুল্লনা-ধনপতির প্রণয়, লহনা-খুল্লনার কলহ ইত্যাদি কাহিনিগুলির পরিবর্তন করে খানিকটা নিজের মতো করে নির্মাণ করেছেন রামানন্দ। মুকুন্দের কাহিনির দ্বিতীয় অংশে রয়েছে—

১. বাণিজ্য-যাত্রার আগে ধনপতির দ্বারা চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত

২. বাণিজ্য তরী ধ্বংস

৩. চণ্ডীর 'কমলে-কামিনী' রূপে ছলনা

৪. ধনপতির কারাবাস

৫. কারা মুক্তি

৬. দেশে প্রত্যাবর্তন ও মিলন।

রামানন্দ এসব ঘটনার কিঞ্চিত পরিবর্তন করলেও অগ্রজদের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখেছেন।

লোকায়ত প্রসঙ্গ :

মঙ্গলকাব্যে লোকায়ত প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করা যায় না। মুকুন্দের কাব্যে কাহিনির গঠনে লোকপুরাণের বিশ্বস্ত অনুসরণ, কাহিনি বিন্যাসে লোকায়ত উপাদান সুস্পষ্ট। যেমন—

১. মুকুন্দের কাব্যের বন্দনাংশে সারি, জারি ইত্যাদি পরিবেশনের বন্দনা রীতি উল্লেখযোগ্য। কবিকঙ্কণ শুধুমাত্র দেব-দেবীদের বন্দনা গান করেননি, পৃষ্ঠপোষক রাজারও বন্দনা করেছেন। রামানন্দ কাব্যে বন্দনাংশে লৌকিক রীতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন।

২. বারমাস্যা প্রয়োগের ব্যাপকতা প্রায় সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। নারী জীবনের আশা-আকাঙক্ষা, পাওয়া-নাপাওয়ার কথা এই বারমাস্যা থেকে উঠে এসেছে। লোকসাহিত্যের আঙিনার সঙ্গে যার যোগ সুস্পষ্ট। রামানন্দ এই প্রথাকে অনুসরণ করেছেন।

৩. ছাগ মুণ্ড কেটে দক্ষের গলায় সংস্থাপন, নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন, শিবকে পিপিলিকার দংশন এসব ঘটনার অনুসঙ্গে লোককাহিনির মোটিফ দেখতে পাওয়া যায়।

৪. লোকবিশ্বাস, লোকাচার, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতির উপস্থিতি মুকুন্দের কাব্যে অধিক পরিমানে রয়েছে। রামানন্দ সেসব বর্ণনা খানিকটা গ্রহণ করলেও অনেকাংশে তা বর্জন করেছেন।

৫. মুকুন্দের পশুগণের 'গোহারি' অংশটি সম্পূর্ণরূপেই পশুকথা বা উপকথার দ্বারা প্রভাবিত। রামানন্দ এই অংশটি একেবারেই ত্যাগ করে কাহিনিকে পরিণতির পথে নিয়ে গেছেন।

লোকায়ত কাহিনির নিজস্ব একটি শ্রেণি আছে। তবে কোন বিশেষ শ্রেণির কাহিনি হিসেবে চণ্ডীমঙ্গলকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কারণ এ রচনা একটি মিশ্র গঠনের আখ্যান। সাধারণত লোককাহিনিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে—

ক. মিথ যুক্ত আখ্যান

খ. জীবজন্তুর কাহিনি

গ. দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাহিনি।

মুকুন্দের কাহিনিতে এ জাতীয় একাধিক শ্রেণি মিশে রয়েছে, যা রামানন্দের কাব্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

ক. মিথ যুক্ত আখ্যান : দেবখণ্ডে কয়েকটি কাহিনিতে মিথ যুক্ত আখ্যান রয়েছে। যেমন—শিব-গৌরীর আখ্যান, দক্ষের কাহিনি ইত্যাদি। আবার কালকেতু আখ্যানেও মিথের প্রচুর উল্লেখ রয়েছে। যেমন—

''হুক হুক রবে কান্দে বনের মর্কট
মিরাসে নাহিক কাজ বীর সনে হট।
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম-সেনাপতি
সাগর লঙ্ঘিয়া আইল গগনে পদাতি।''[১৬]

রামানন্দের কাব্যেও মিথ কাহিনির প্রচুর প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ধনপতি উপাখ্যানে—

১. ''জতুগৃহ দাহ তো পরীক্ষা মধ্যে নাঞি।
অশাস্ত্রে কে উত্তীর্ণ হৈয়াছে কোন ঠাঞি।
জতুগৃহ দাহ সবে আদিপর্বে আছে।
দুর্যোধন কর্যাছিল পণ্ডিতের পাছে।।''[১৭]

২. ''রাবণ তনয় তাঁর সেবিল চরণ মার
মায়া কর্যা গেলেন লঙ্কায়।
ছায়া সীতা ব্যাস মতে রাবণের মৃত্যু পথে
নিলেন বলিয়া রাখনায়।।''[১৮]

খ. জীবজন্তুর কাহিনি : এই কাহিনিতে পশুরা মানুষের মতো আচরণ করে ও কথা বলে। পশুদের নিয়ে আখেটিক খণ্ডে এক স্বতন্ত্র কাহিনি গড়ে তুলেছেন কবিকঙ্কণ। যেখানে রয়েছে সিংহের কাছে পশুদের আবেদন, পশুদের যুদ্ধযাত্রা, দেবী চণ্ডীর কাছে পশুদের বিলাপ ইত্যাদি। পশুদের আচরণের মধ্যে মানুষের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়—

১. ''সশুর সাশুড়ি মৈল দেওর ভাসুর

পতি মইল রতিসুখ বিধি কৈল দূর।
ছিত অভাগির এক পেটরাড় পো
পাষুরিব কেমতে তাহার মায়া মো।''[১৯]

২. ''হস্তী বলে অতি বড় মোর কলেবর
লুকাইতে স্থল নাহি বীরের গোচর।
কি করি কোথাত্র জাই কোথা গেলে তরি
আপনার দন্তদুটা আপনার অরি।''[২০]

গ. দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাহিনি : মুকুন্দ শিব-গৌরী ও কালকেতু-ফুল্লরার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন। রামানন্দ 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন না।

ঘ. রূপকথার কাহিনি : কলিঙ্গ দেশে যাত্রা পথের বর্ণনা, কমলে-কামিনী দৃশ্যগুলি কাব্যমধ্যে রূপকথার চিত্রকল্প নির্মাণ করেছে।

ঙ. কৌতুক কাহিনি : মুকুন্দের কাব্যে ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারী শীল চরিত্রের মধ্যে কৌতুক কাহিনি সৃষ্টি হয়েছে। রামানন্দের কাব্যে এই দুটি চরিত্রের গুরুত্ব প্রকাশিত হয়নি। বরং তিনি দক্ষযজ্ঞ নাশের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে কাহিনি মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে।

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির কাব্যে ধ্বনিগত শৈলীবিচার :

শৈলী বিশ্লেষণের একটি অন্যতম কৌশল হল ধ্বনি নির্ভরতা। প্রকৃতপক্ষে ধ্বনি বিন্যাসের সঙ্গে লেখক ও পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ কীভাবে গড়ে ওঠে তা বিশ্লেষণেই ধ্বনিকেন্দ্রিক শৈলীবিচারের অন্যতম লক্ষ। ধ্বনির পুনরুক্তি (repetition) আর সমান্তরালতা (parallelism) ধ্বনিকেন্দ্রিক শৈলীবিজ্ঞানের অন্যতম বিচার্য বিষয়। ধ্বনির পৌনঃপুনিকতা, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সুষম বিন্যাস এবং পরস্পর-সংলগ্নতা (cohesiveness) ধ্বনির সংগীত গড়ে তোলে। ধ্বনিবিন্যাসের মাধ্যমে ভাবেরও প্রকাশ ঘটতে পারে। পুনরুক্তি মানেই সমান্তরালতা নয়। সমান্তরালতার মধ্যে মিল ও অমিলের দ্বন্দ্ব থাকে। কারণ মিলের জন্য অমিলের প্রয়োজন হয়। যেমন—

১. ''হাথে লইল পত্র মসী আপনি কলমে বসি

নানা ছন্দে লিখিল সঙ্গীত।”[২১]

‘সী’ বা ‘স’ এবং ‘ত’ ধ্বনির প্রয়োগ এবং ক্রমের বৈপরীত্য নির্মাণ করে এক সমান্তরাল গঠন। কারণ ধ্বনির পুনরুক্তির পাশাপাশি একজাতীয় বৈপরীত্যও সৃষ্ট হয় এধরণের বিন্যাসে।

সমান্তরালতা সম্পর্কে শিশির কুমার দাশ বলেছেন—“... একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে এক ধরণের বাক্য বা বাক্যাংশ ফিরে ফিরে আসে। কখনও সমদৈর্ঘ্যের বা প্রায় সমদৈর্ঘ্যের, কিংবা সমগঠনের পদগুচ্ছ ঝাক বেঁধে আসে। আবার কখনও বা একটি শব্দ পুনরাবৃত্ত হতে থাকে।... সমান্তরালতা বলতে বোঝাতে চাইছি সমগঠনের বা প্রায় সমগঠনের কোন আন্বয়িক উপাদানের বারবার ব্যবহার এবং তার ফলেই একটি সৌষম্যের সৃষ্টি হয়। শুধু একটি বাক্যের মধ্যে নয়, বাক্যের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র অনুচ্ছেদের মধ্যে এক ধরণের আন্বয়িক উপাদানের আবর্তনে সৃষ্টি হয় একটি বিশেষ সংগীত এবং সমগ্র অংশের মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য। সমান্তরালতার নানা রূপ সৃষ্টি সম্ভব।”[২২]

সাহিত্য সমালোচক লিচ সমান্তরালতা সম্পর্কে বলেছেন— “With parallelism where the language allows him to choice, he consistently limits himself to the some option”[২৩]

প্রকাশ কুমার মাইতির মতে—সমান্তরালতা এক ধরণের বিশেষ ভাষা ব্যবহারের রীতি যা একই প্যাটার্ণের একাধিক বাক্যের পরপর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়। গদ্য, পদ্য উভয় প্রকার রচনাতে সমান্তরালতা দেখা যেতে পারে। তবে কবিতায় এর প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। ... সমান্তরালতা নিয়ে প্রথম বিধিবদ্ধ আলোচনার চেষ্টা করেন ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী হ্যালিতে এবং লিচ। পুনরুক্তিকেও সমান্তরলতার অন্তগর্ত করেছেন লিচ। ... তবে গভীর ভাবে বিষয়টি বিচার করলে দেখা যাবে পুনরুক্তি ঠিক সমান্তরালতা নয়। এই একই কারণে ধ্রুবপদকেও সমান্তরালতার অন্তর্গত করা যায় না। আসলে সমান্তরালতা বিচারের ক্ষেত্রে আলোচ্য বাক্যগুলির অধোগঠনে অর্থের পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি দুটি বাক্যের বাহ্যগঠন একই প্রকারের হয়, কিন্তু অধোগঠনে (D.S) অর্থের (sementies) পার্থক্য থাকে তবে একই ধ্রুবকের নিয়ন্ত্রণে থাকা ওই দুটি বাক্যের মধ্যে সমান্তরালতা রয়েছে বলা যেতে পারে।”[২৪]

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির কাব্যে বিষয়টি এইভাবে দেখানো যেতে পারে—

১. “রাম রাম স্মচরণে পোহাইল রজনি

শয্যা থাকিয়া প্রভাতে উঠিলা শুলপানি।''[২৫]

২. ''শূন শুন নররায় রাহি দূঢ় সুনিশ্চয়
শূনহ কলিঙ্গ মহীপাল।''[২৬]

৩. ''দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতিনাশিনী
গোকুল রাখিলে জয়া যশোদানন্দিনী।''[২৭]

৪. ''যে দেখে সাধুরে তারি আঁখি ঝুরে
জিজ্ঞাসয়ে ঘন ঘন।।[২৮]

৫. ''দুঃসহ জঠরানলে প্রাণ আনছান।
কান্দিতে কান্দিতে সাধু আঁখি মুছ্যা খান্।।''[২৯]

৬. ''কালু রায় কালু রায় ফুকরায় পায় পায়
কালু রায় রক্ষক নায়ের।।''[৩০]

উভয়ের কাব্যে ধ্বনিগত শৈলীবিচার সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রেখে আলোকপাত করা যেতে পারে—

ক. ''ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পুনরাবর্তন

খ. দলগঠনে মিল মিলের বৈচিত্র্য এবং অন্ত্যমিলের বৈশিষ্ট্য

গ. দল গঠনের প্রকৃতি ও দলের পরিমিত দৈর্ঘ্য

ঘ. ধ্বনিগত সমান্তরালতা।

ঙ. ধ্বনিকেন্দ্রিকতা এবং ধ্বনির প্রতীকধর্মিতা

চ. ছন্দ ও ছন্দস্পন্দ।

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির কাব্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এই শব্দ অন্য শব্দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে পাঠক বা শ্রোতার অনুভূতির দরবারে হাজির হতে পারে।

মুকুন্দ চক্রবর্তী—

১. ‘‘দশনের কড়মড়ি জেন ঢাকে পড়ে বাড়ি।’’[৩১]

২. ‘‘হুক হুক রবে কান্দে বনের মর্কট।’’[৩২]

৩. ‘‘বনে বনে বেড়াইআ পাইআছি বড় দুঃখ।’’[৩৩]

রামানন্দ যতি—

১. ‘‘যজ্ঞ ভূমির তলে করিল ঝলমল।।[৩৪]

২. ‘‘লোক না আইল দেখ্যা আঁখি ছলছল।।’’[৩৫]

৩. ‘‘ কোলে করি কন মরি আহা বুক বুক।।’’[৩৬]

৪. ‘‘কাঁপে ওষ্ঠাধর অঙ্গ থর থর।’’[৩৭]

৫. ‘‘কি হৈল কি হৈল বল্যা প্রাণ আন ছান।’’[৩৮]

মিলের বৈচিত্র্য :

কবিতায় মিল কবিতার বিশেষ অলঙ্কার। একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ কবিতায় এক ধ্বনিকল্পের সৃষ্টি করে এবং বিশেষ অর্থের দ্যোতনাকে উদ্ভাসিত করে। মিলের মাধ্যমে কবির মানস প্রবণতার সন্ধান পাওয়া যায়। দলভুক্ত ধ্বনি সংগঠনকে মোট ছ’ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—

১. আদি ব্যঞ্জন মিল

২. অন্ত্য ব্যঞ্জন মিল

৩. স্বরমিল

৪. আদি দল মিল

৫. অন্ত্য দল মিল

৬. প্রান্ত মিল

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের মানদণ্ডের বিচারে বিষয়টি দেখা যেতে পারে—

১. ''সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে নাল
বিনি উবগারে খায় ধুতি।''[৩৯]

২. ''বিধি মুখে বেদবাণী বঙ্গো দেবী বীনাপাণি।[৪০]

৩. ''নাহি কেহ সহচর অসুর দেবতা নর
সিদ্ধ নাগ চারণ কিন্নর।''[৪১]

৪. ''হেন পাপ কায় রাখিয়াছি হায়
দেখ শিব তনু যায়।।''[৪২]

৫. মেনকারে বলি যায়্যা দেখিব কেমন মায়্যা।।''[৪৩]

৬. কালু রায় কালু রায় ফুকরয়ে পায় পায়
কালু রায় রক্ষক নায়ের।।''[৪৪]

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির কাব্যে রূপগত শৈলীবিচার :

কাব্যের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কারণ রূপতাত্ত্বিক সংগঠনে লেখকের উদ্ভাবনী শক্তি, সাংগঠনিক শিল্পকৌশল বা ব্যক্তিত্ব অনেকসময় ধরা পরে না। কাব্যের শৈলীগত আলোচনায় রূপতাত্ত্বিক সংগঠনের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রাসঙ্গিক—

১. উপসর্গ বিচার

২. পরসর্গ রূপে ব্যবহৃত কতকগুলি প্রত্যয়ের প্রয়োগ ও বিচার

৩. সমাস বিচার

৪. অনুসর্গের প্রয়োগ

৫. বহুবচন জ্ঞাপক সংগঠনের প্রয়োগ

৬. সংযোজকের ব্যবহার

৭. সর্বনামের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য

৮. কারক বিভক্তি প্রয়োগের রীতি

৯. লিঙ্গ-সৌষম্য বিচার

১০. ক্রিয়াগঠনের বৈশিষ্ট্য

উপসর্গ ও উপসর্গ-স্থানীয় উপাদানের প্রয়োগ :

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি উভয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত উপসর্গের ওপর নির্ভরশী। তবে ছন্দ বা বৈচিত্রের প্রয়োজনে অনেকসময় মূল উপসর্গ বা উপসর্গযুক্ত শব্দগুলির পরিবর্তন ঘটে। যেমন—

১. ''প্রকাশিলা আগম পুরান।''[৪৫]

২. ''প্রবেশিয়া পাইল পাতাল।''[৪৬]

৩. ''গৌরী নারিলা ধরিবারে।''[৪৭] (< ধরবারে)

৪. ''গোমুণ্ডে স্থাপিলা ষষ্ঠি দ্বার ডানিভাগে।''[৪৮] (< ডান ভাগে)

৫. ''মা বলিয়া ডাকিলা কাহাকে।''[৪৯] (< কাকে)

ক্রিয়া গঠনের বৈশিষ্ট্য :

চৈতন্য পরবর্তী কবি হওয়ায় সংস্কৃতের প্রভাব থেকে কবিকঙ্কণ এবং রামানন্দ কেউই মুক্ত নন। একটি বিশিষ্ট যুগের প্রচলিত নর্মে তাঁরা বাঁধা পড়েন। ফলে কবিদ্বয়ের ভাষা যুগপ্রচলিত ব্যাকরণ কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ক্রিয়াগঠনে উভয়েই সংস্কৃতের অনুশাসন মেনে চলেন। গঠনের বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁদের শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের হদিশ মেলে। যেমন—

১. ''পাইলা বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বাড়।''[৫০]

২. ''পাগল হইয়া পতি ছাই মাখে গায়।''[৫১]

৩. ''প্রেত ভূত দানা দূত ক্রোধে থর থর।''[৫২]

পরসর্গ রূপে ব্যবহৃত কতকগুলি প্রত্যয়ের প্রয়োগ ও বিচার—

১. ''প্রসূতির পাণিগ্রহণ কৈল দক্ষমুনি''[৫৩]

২. ''ভাজিয়া কাঠাল-বিচি দিবে দুই কুড়ি''[৫৪]

৩. ''পাইআ বীরের সাড়া...।''[৫৫]

৪. ''শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী।''[৫৬]

৫. ''জদি বন্দীশালে মোর বার্য্যায় পরাণী।''[৫৭]

লক্ষণীয় একই চরণে বিভিন্ন প্রকারের স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় (যেমন—আ, ইনী ইত্যাদি) বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

প্রত্যয় প্রয়োগের মাধ্যমে প্রায়শই কবিরা অভিনব শব্দ গঠন করেছেন—

১. ''শিরে ছত্র নন্দি ধরা।''[৫৮]

২. ''বৃহস্পতি আন্যা কৈলা যজ্ঞের আরম্ভ।''[৫৯]

খ. বয়ান-অতিরিক্ত প্রসঙ্গে (Extra-Textual) :

বয়ানকেন্দ্রিক আলোচনার সমান্তরালে বয়ান অতিরিক্ত আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ সমকাল, আঞ্চলিকতা, সামাজিক পরিস্থিতি, কবির যুগোপযোগী ধ্যানধারণা ইত্যাদি কবিদের নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কবি মুকুন্দ ও কবি রামানন্দ দুই ভিন্ন শতাব্দীর কবি। উভয়ের কাব্যে ভিন্ন সমাজ ও মনোভাব প্রত্যক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক। বাঙালি জাতি মিশ্র সংস্কৃতির পরিচায়ক। তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙালি সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যে সামাজিক পরিবর্তনগুলি সূচিত হল, সেগুলি হল নিম্নরূপ—

১. উচ্চ ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ

২. পরাজিত হিন্দু সমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মাধ্যমে নিজেদের টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করল।

৩. প্রথমে হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের ঐক্য সমাজে এক ভিন্ন আদর্শের সৃষ্টি করল।

উচ্চ ও নিম্নবর্গের সংযোগ বাঙলা সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছিল। ফলে বাঙালির নিজস্ব লৌকিক ধর্ম-সংক্রান্ত আখ্যায়িকাগুলি 'মঙ্গলকাব্য' রূপে আত্মপ্রকাশ করল। বাঙলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে দেবীকে প্রধান রূপে পাওয়া যায় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। 'চণ্ডীমঙ্গলে' যে দেবীর সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি তিনি হলেন মঙ্গল চণ্ডিকা। এই মঙ্গল-চণ্ডিকা পৌরাণিক

চণ্ডী দেবীর অভিন্ন রূপ নন। তিনি বাংলাদেশের লৌকিক দেবী। বাংলাদেশের মেয়েদের ব্রতের দেবী। চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমন্বের চিত্র আমরা দেবীর রূপের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। কাব্যে দেবীর নানাবিধ রূপ— ক. দক্ষ কন্যা সতী, খ. হিমালয় দুহিতা পার্বতী, গ. কালকেতু আখ্যানে দেবী চণ্ডী, ঘ. ধনপতি উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী। নীচ ব্যাধ জাতির মধ্যে প্রচলিতা দেবীর মর্ত্যে পূজা প্রচারের বিষয়টি আসলে বাংলাদেশের সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস। বাংলার রাঢ় অঞ্চলে আজও আদিম অধিবাসীদের বাস। সমাজ বিবর্তনের ফলে তারা অনেকে বাঙালির জাতীয় জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। তেমনি তাদের দেব-দেবীরাও হিন্দু সমাজের বিশেষত উচ্চ কোটির হিন্দু দেব সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত সংরূপের আদলে তাঁদের কাব্যকে গড়ে তুলেছেন। কাব্যের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি মূলত কবির মানসগঠনের সামাজিক দিকগুলিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। তবে মুকুন্দের কাব্যে এই সমাজ যেভাবে ধরা দিয়েছে রামানন্দের কাব্যে তা অন্তরালে রয়ে গেছে। ষোড়শ শতকের একটি বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা কবি মুকুন্দ উল্লেখ করেছেন। সেখানে মুসলমানী শাসন ব্যবস্থাকে কবি অভিযুক্ত করেননি বরং ডিহিদারের অত্যাচারের কথা বলেছেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কালে বাংলাদেশে যে ভক্তিবাদের প্লাবণ এসেছিল, বাঙালির সামাজিক দৃষ্টিতেও পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। মুকুন্দ খুব সম্ভবত ছিলেন পঞ্চোপাসক হিন্দু ছিলেন। ফলে বৈষ্ণবীয় ভাবনাকে তিনি আত্মসাৎ করে শাক্তকাব্যে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। আর রামানন্দ ছিলেন সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব। সে কারণে রামানন্দের কাব্যে বৈষ্ণব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব নানা স্থানে স্পষ্টরূপেই দেখতে পাওয়া যায়। মুকুন্দের কাব্যে সামাজিক প্রসঙ্গ বিচার করতে গিয়ে দেখা যায় কিছু কিছু সামাজিক বিষয় কাব্যে বারবার উঠে এসেছে। যেমন—উদ্বাস্তু সমস্যা, অত্যাচারিত মানুষদের দুরবস্থা, দারিদ্র ও ধনীদের বিরোধ, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ, সমাজে বহু পত্নী রাখার প্রবণতা ইত্যাদি। রামানন্দ তার কাব্যে সমাজের কলুষিত দিকগুলিকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি একজন সন্ন্যাসী হওয়ায় সমাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর কাব্যে বাস্তবতাবোধের অভাব লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে মুকুন্দের কাব্যে কালকেতুর নগর-পত্তনের কাহিনি, পশুগণের ক্রন্দন, বারমাস্যা এবং নারীগণের পতিনিন্দা অংশগুলি সমকালীন সমাজের দর্পণ হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. Bradford, Richard; 1997; Stylistics; Routledge, London, p. 3.

২. বীর, তন্ময় : শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক বাংলা কবিতা, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা-৭৩, (রায় অপুর্বকুমার, শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য), পৃ. ১০।

৩. Krishnaswami, N., Varma, S.K., Nagarajan, M., : Modern Applied Linguistics, An Introduction, Macmillan India Ltd., 1992, p. 15.

৪. বীর, তন্ময় : শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক বাংলা কবিতা, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৭৯।

৫. Haas, W. : Linguistics Relevance, in Bazell et.al (1966). p. 135.

৬. Leech, Geoffrey : N and short, Michacl it. style in Fiction, Longman.

৭. Ullmann, Stephen : Style in the French Novel, England (1957), p. 10.

৮. Charles W. Hockett : A Course in Modern Linguistics, New York (1964), p. 19.

৯. Morton, A. Q. : Graphs to detect the identity of classical authors stateman, December, 2, (1965).

১০. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৩১।

১১. তদেব, : পৃ. ৩।

১২. তদেব, : পৃ. ২২।

১৩. তদেব, : পৃ. ২২।

১৪. সেন, নবেন্দু : বাংলা গদ্য : স্টাইলিস্টিকস্, মহাদিগন্ত, বারুইপুর, চব্বিশ পরগণা (দ), ৭৪৩৩০২, পৃ. ১৯-২০।

১৫. Hayward, John (ed) : Tradition and Individual Talent : T. S. Elliot; Selected Prose, 1965, p. 26.

১৬. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৫০।

১৭. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ২৪৫।

১৮. তদেব, : পৃ. ২৪৭।

১৯. তদেব, : পৃ. ৫০।

২০. তদেব, : পৃ. ৫০।

২১. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৪।

২২. দাশ, শিশিরকুমার : কবিতার মিল ও অমিল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ.৩৭।

২৩. Leech, G (1984) : A Linguistic Guide to English Poetry London : Longman, p. 64.

২৪. মাইতি, ড. প্রকাশ কুমার : আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা, আরামবাগ বুক হাউস, জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ২৭৭-২৭৮।

২৫. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ২৬।

২৬. তদেব, : পৃ. ২৯।

২৭. তদেব, : পৃ. ৩০।

২৮. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ২৭৩।

২৯. তদেব, : পৃ. ২৬৯।

৩০. তদেব, : পৃ. ২৬০।

৩১. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৪৮।

৩২. তদেব, : পৃ. ৫০।

৩৩. তদেব, : পৃ. ৫৪।

৩৪. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১১০।

৩৫. তদেব, : পৃ. ১১০।

৩৬. তদেব, : পৃ. ১১৪।

৩৭. তদেব, : পৃ. ১১৬।

৩৮. তদেব, : পৃ. ১১৭।

৩৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য

অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৩।

৪০. তদেব, : পৃ. ২

৪১. তদেব, : পৃ. ৬

৪২. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১১৬।

৪৩. তদেব, : পৃ. ১২৫।

৪৪. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১।

৪৫. তদেব, : পৃ. ৮।

৪৬. তদেব, : পৃ. ২২।

৪৭. তদেব, : পৃ. ৪১।

৪৮. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ২৯০।

৪৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৬৬।

৫০. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৬২।

৫১. তদেব, : পৃ. ১১৮।

৫২. তদেব, : পৃ. ১২৫।

৫৩. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ

রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৯।

৫৪. তদেব, : পৃ. ২৬।

৫৫. তদেব, : পৃ. ৬৬।

৫৬. তদেব, : পৃ. ৫৮।

৫৭. তদেব, : পৃ. ২১৪।

৫৮. তদেব, : পৃ. ৫৯।

৫৯. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১০৯।